



উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন

কাজী নজরুল ইসলাম



লেখক পরিচিতি

কাজী নজরুল ইসলাম ১৮৯৯ সালের ২৫ মে (বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ) পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম দুখু মিয়া। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। নজরুল অল্প বয়সেই পিতামাতা দুজনকেই হারান। শৈশব থেকেই দারিদ্র্য আর দুঃখ-কষ্ট তাঁর সঙ্গী হয়েছিল। স্কুলের ধরাবাঁধা জীবনে কখনোই তিনি আকৃষ্ট হননি। ছেলেবেলায় তিনি লেটো গানের দলে যোগ দেন। পরে বর্ধমানে ও ময়মনসিংহের ত্রিশাল থানার দরিরামপুর হাইস্কুলে লেখাপড়া করেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ৪৯ নং বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে করাচিতে যান। যুদ্ধশেষে নজরুল কলকাতায় ফিরে আসেন ও সাহিত্যসাধনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯২১ সালে ‘বিদ্রোহী’ কবিতা প্রকাশের পর সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে পরিচিত হন। তাঁর লেখায় তিনি বিদেশি শাসক, সামাজিক অবিচার ও অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নজরুল সাহিত্য রচনা ছাড়াও কয়েক হাজার গানের রচয়িতা। তিনি বেশ কয়েকটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। তিনি গজল, খেয়াল ও রাগপ্রধান গান রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। আরবি-ফারসি শব্দের সার্থক ব্যবহার তাঁর কবিতাকে বিশিষ্টতা দান করেছে। গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ রচনায়ও তিনি কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। নজরুল ১৯৪০ সালের দিকে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেন। ১৯৭২ সালে কবিকে ঢাকায় আনা হয়। তাঁকে বাংলাদেশের জাতীয় কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডিলিট উপাধি প্রদান করেন। ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

নজরুলের প্রধান রচনা :

কাব্যগ্রন্থ : অগ্নি-বীণা, বিষের বাঁশী, সাম্যবাদী, সর্বহারা, ফণিমনসা, সিঙ্কু-হিন্দোল, চক্রবাক, ছায়ানট;

উপন্যাস : বাঁধনহারা, কুহেলিকা, মৃত্যুক্ষুধা;

গল্প : ব্যথার দান, রক্তের বেদন;

প্রবন্ধ : যুগবাণী, রুদ্রমঙ্গল, দুর্দিনের যাত্রী, রাজবন্দীর জবানবন্দী।

ভূমিকা

বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত ‘নজরুল রচনাবলী (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ, প্রথম খণ্ড) থেকে ‘উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন’ শীর্ষক প্রবন্ধটি নেয়া হয়েছে। অবিভক্ত ভারতবর্ষের পটভূমিতে লেখা প্রবন্ধটি সম্পাদনা করে পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। এটি কাজী নজরুল ইসলামের ‘যুগবাণী’ নামক প্রবন্ধ গ্রন্থের একটি রচনা। সাম্যবাদী চেতনার বিকাশ এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এবং জাতীয় উন্নয়নে গণ-মানুষের উপেক্ষিত শক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব সম্পর্কে এ প্রবন্ধে ধারণা দেওয়া হয়েছে।



উদ্দেশ্য

‘উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন’ প্রবন্ধটি পড়া শেষে আপনি-

- দেশ ও জাতির উন্নতিতে নিম্ন-শ্রেণি-বর্ণের মানুষের অংশগ্রহণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ভদ্রলোক-সমাজের মনের ও চিন্তার দীনতা বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- মহাত্মা গান্ধীর কর্মপন্থার এক বিশিষ্ট দিকের পরিচয় লিখতে পারবেন।



মূলপাঠ

“হে মোর দুর্ভাগা দেশ! যাদের করেছ অপমান
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।”

— রবীন্দ্রনাথ

আজ আমাদের এই নূতন করিয়া মহাজাগরণের দিনে আমাদের সেই শক্তিকে ভুলিলে চলিবে না— যাহাদের উপর আমাদের দশ আনা শক্তি নির্ভর করিতেছে, অথচ আমরা তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছি। সেই হইতেছে, আমাদের দেশের তথাকথিত ‘ছোটলোক’ সম্প্রদায়। আমাদের আভিজাত্য-গর্বিত সম্প্রদায়ই এই হতভাগাদের এইরূপ নামকরণ করিয়াছেন। কিন্তু কোনো যন্ত্র দিয়া এই দুই শ্রেণির লোকের অন্তর যদি দেখিতে পারো, তাহা হইলে দেখিবে, ঐ তথাকথিত ‘ছোটলোক’-এর অন্তর কাচের ন্যায় স্বচ্ছ, এবং ঐ আভিজাত্য-গর্বিত তোমাদের ‘ভদ্রলোকের’ অন্তর মসীময় অন্ধকার। এই ‘ছোটলোক’ এমন স্বচ্ছ অন্তর, এমন সরল মুক্ত উদার প্রাণ লইয়াও যে কোনো কার্য করিতে পারিতেছে না, তাহার কারণ এই ভদ্র সম্প্রদায়ের অত্যাচার। সে বেচারী জন্ম হইতে এই ঘৃণা, উপেক্ষা পাইয়া নিজে কে এত ছোট মনে করে, সঙ্কোচ জড়তা তাহার স্বভাবের সঙ্গে এমন ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া যায় যে, সেও-যে আমাদেরই মতো মানুষ— সেও যে সেই এক আলগা-এর সৃষ্টি, তাহারও যে মানুষ হইবার সমান অধিকার আছে,— তাহা সে একেবারে ভুলিয়া যায়। যদি কেউ এই উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করে, অমনি আমাদের ভদ্র সম্প্রদায় তাহার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করিয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলে। এই হতভাগাদিগকে— আমাদের এই সত্যিকার মানুষদিগকে আমরা এই রকম অবহেলা করিয়া চলিয়াছি বলিয়াই আজ আমাদের এত অধঃপতন। তাই আমাদের দেশে জনশক্তি বা গণতন্ত্র গঠিত হইতে পারিতেছে না। হইবে কিরূপে? দেশের অধিবাসী লইয়াই তো দেশ এবং ব্যক্তির সমষ্টিই তো জাতি। আর সে-দেশকে, সে-জাতিকে যদি দেশের, জাতির সকলে বুঝিতে না পারে, তবে তাহার উন্নতির আশা করা আর আকাশে অট্টালিকা নির্মাণের চেষ্টা করা একই কথা। তোমাদের আভিজাত্য-গর্বিত, ভণ্ড, মিথ্যুক ভদ্র সম্প্রদায় দ্বারা— (যাহাদের অধিকাংশেরই দেশের, জাতির প্রতি সত্যিকার ভালোবাসা নাই) মনে কর কি দেশ উদ্ধার হইবে? তোমরা ভদ্র সম্প্রদায়, মানি, দেশের দুর্দশা জাতির দুর্গতি বুঝো, লোককে বুঝাইতে পারো এবং ঐ দুর্ভাগ্যের কথা কহিয়া কাঁদাইতে পার, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে নামিয়া কার্য করিবার শক্তি তোমাদের আছে কি? না, নাই। এ-কথা যে নিরেট সত্য, তাহা তোমরাই বুঝো। কাজেই তোমাদের এই দেশকে, জাতিকে উন্নত করিবার আশা ঐ কথাতেই শেষ হইয়া যায়। কিন্তু যদি একবার আমাদের এই জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারো, তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া ভাই বলিয়া কোল দিবার তোমার উদারতা থাকে, তাহাদিগকে শক্তির উন্মেষ করিতে পারো, তাহা হইলে দেখিবে তুমি শত বৎসর ধরিয়া প্রাণপণে চেষ্টা সত্ত্বেও যে-কাজ করিতে পারিতেছ না, একদিনে সেই কাজ সম্পন্ন হইবে। একথা হয়তো তোমার বিশ্বাস হইবে না, একবার মহাত্মা গান্ধীর কথা ভাবিয়া দেখো দেখি! তিনি ভারতে কী অসাধ্য সাধন করিতে পারিয়াছেন!

তিনি যদি এমনি করিয়া প্রাণ খুলিয়া ইহাদের সহিত না মিশিতেন, ইহাদের সুখ-দুঃখের এমন করিয়া ভাগী না হইতেন, ইহাদিগকে যদি নিজের বুকের রক্ত দিয়া, তাহারা খাইতে পাইল না বলিয়া নিজেও তাহাদের সঙ্গে উপবাস করিয়া ইহাদিগকে নিতান্ত আপনার করিয়া না ভুলিতেন, তাহা হইলে আজ তাঁহাকে কে মানিত? কে তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিত? কে তাঁহার একটি ইঙ্গিতে এমন করিয়া বুক বাড়াইয়া মরিতে পারিত? ইঁহার আভিজাত্য-গৌরব নাই, পদ-গৌরবের অহঙ্কার নাই, অনায়াসে প্রাণের মুক্ত উদারতা লইয়া তোমাদের ঘৃণ্য এই ‘ছোটলোক’কে বক্ষে ধরিয়া ভাই বলিয়া ডাকিয়াছেন,— সে আহ্বানে জাতিভেদ নাই, ধর্মভেদ নাই, সমাজ-ভেদ নাই,— সে যে ডাকার মতো ডাক,— তাই নিখিল ভারতবাসী, এই উপেক্ষিত হতভাগারা তাঁহার দিকে এত হা হা করিয়া ব্যগ্রবাছ মেলিয়া ছুটিয়াছে। হায়, তাহাদের যে আর কেহ কখনো এমন করিয়া এত বুকভরা স্নেহ দিয়া আহ্বান করেন নাই! এ মহা-আহ্বানে কি তাহারা সাড়া না দিয়া পারে? যদি পারো, এমনি করিয়া ডাকো, এমনি করিয়া এই উপেক্ষিত শক্তির বোধন করো— দেখিবে ইহারাই দেশে যুগান্তর আনিবে, অসাধ্য সাধন করিবে। ইহাদিগকে উপেক্ষা করিবার, মানুষকে মানুষ হইয়া ঘৃণা করিবার, তোমার কি অধিকার আছে? ইহা তো আত্মার ধর্ম নয়। তাহার আত্মা তোমার আত্মার মতোই ভাস্বর, আর একই মহা-আত্মার অংশ। তোমার জন্মগত অধিকারটাই কি এত বড়? তুমি যদি এই চণ্ডাল বংশে জন্মগ্রহণ করিতে, তাহা হইলে তোমার মতো ভদ্রলোকদের দেওয়া



এই সব হত্যার উপেক্ষার আঘাত, বেদনার নির্মমতা একবার কল্পনা করিয়া দেখো দেখি, -ভাবিতে তোমার আত্মা কি শিহরিয়া উঠিবে না?

আমাদের এই পতিত, চণ্ডাল, ছোটলোক ভাইদের বুকে করিয়া তাহাদিগকে আপন করিয়া লইতে, তাহাদেরই মতো দীন বসন পরিয়া, তাহাদের প্রাণে তোমারও প্রাণ সংযোগ করিয়া উচ্চ শিরে তার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও, দেখিবে বিশ্ব তোমাকে নমস্কার করিবে। এস, আমাদের উপেক্ষিত ভাইদের হাত ধরিয়া আজ বোধন-বাঁশিতে সুর দিই-

‘কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ!’ □



নির্বাচিত শব্দের অর্থ ও টীকা :

অট্টালিকা- প্রাসাদ। অধিবাসী- নিবাসী; বাসিন্দা। অভিজাত্য- কৌলীন্য; বংশমর্যাদা। উন্মেষ- উদ্বেক; সূত্রপাত। উপেক্ষা- তুচ্ছতাচ্ছিল্য, অযত্ন, অনাদর। উৎপীড়ন- উত্যক্তকরণ, জুলুম, অত্যাচার। ওতপ্রোতভাবে- বিশেষভাবে জড়িত; পরিব্যাপ্ত। কর্ণপাত- কান দেওয়া। ক্লেশ- দুঃখ; কষ্ট। চণ্ডাল- চাঁড়াল, হিন্দু বর্ণব্যবস্থায় নিম্নবর্ণের লোক। মসীময়- কালিমাখা; অন্ধকারাচ্ছন্ন। দুর্ভাগা- হতভাগা; অদৃষ্ট মন্দ এমন। দৈন্য- দারিদ্র্য; দীনতা। বিদ্রোহাচরণ- প্রচলিত বা বর্তমান ব্যবস্থার বিরোধিতা করা। বোধন- জ্ঞান; অবগতি। বোধন-বাঁশি- বোধ জাগিয়ে তোলার বাঁশি। ব্যগ্র- ব্যাকুল; আগ্রহযুক্ত; কৌতূহলী। ভাস্বর- দিবাকর; সূর্য; দীপ্তিমান। যুগান্তর- অন্য যুগ।



সারসংক্ষেপ :

ভদ্রলোকেরা যাদের ‘ছোটলোক’ বলে অবজ্ঞা করে, তারাই জনগোষ্ঠীর বড় অংশ। এরাই আসলে কাজের মানুষ। ভদ্রলোকেরা কথায় যত ওস্তাদ, কাজে তত নয়। অকারণ ঘৃণায় তারা নিম্ন-শ্রেণি-বর্ণের মানুষগুলোকেও কুণ্ঠিত করে রাখে। তাই দেশের উন্নতিতে অবদান রাখার লোকের এত অভাব। মহাত্মা গান্ধী এ কথা জানতেন। তিনি নিম্নবর্ণের মানুষগুলোকে আপন করে নিয়েছিলেন। তাই তারাও বাঁপিয়ে পড়েছে তাঁর ডাকে। যে বিপুল মানুষকে আমরা উপেক্ষা করছি, তাদের মধ্যে যদি বিশ্বাস জাগানো না যায়, যদি মানুষ হিসেবে তাদের মধ্যে মর্যাদাবোধ না জাগানো হয়, তাহলে দেশ-জাতির উন্নতি অধরাই থেকে যাবে।



পাঠোত্তর মূল্যায়ন : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- হিন্দু বর্ণব্যবস্থায় নিম্নবর্ণের লোককে কি বলা হয়?
ক. ক্ষত্রিয়
খ. ব্রাহ্মণ
গ. বৈশ্য
ঘ. চণ্ডাল
 - মহাত্মা গান্ধী যে গুণের দ্বারা দেশের জনতাকে সম্মোহিত করেছিলেন-
ক. সন্ন্যাস
খ. বাগ্মিতা
গ. মানবতাবোধ
ঘ. রাষ্ট্রভাবনা
- নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন :
- সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই
একসাথে আছি, একসাথে বাঁচি, আজও একসাথে থাকবই-
সব বিভেদের রেখা মুছে দিয়ে সাম্যের ছবি আঁকবই।
- উদ্দীপকে ‘উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন’ প্রবন্ধের কোন দিকটি উঠে এসেছে?
ক. বর্ণভেদ
খ. জাতিভেদ
গ. মানবতা
ঘ. কুটিলতা
 - উদ্দীপক ও ‘উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন’ প্রবন্ধ অনুসরণে মহাত্মা গান্ধী চরিত্রে যেটা নেই-
i. জাতিভেদ
ii. বর্ণপ্রথা
iii. ধর্মভেদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i
খ. ii
গ. iii
ঘ. i, ii ও iii



কেউ তাতে সুখে নিদ্রা যায়- এ বৈষম্য পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এ বৈষম্য, এ পার্থক্য কৃত্রিম। সবার এক ও অভিন্ন পরিচয়- আমরা সবাই মানুষ।

উদ্দীপকে সারা পৃথিবীতে জাতি-বর্ণ-গোত্র পরিচয়ের উর্ধ্বে যে মানবসমাজ- তার জয়গান ফুটে উঠেছে। মানুষ হিসেবেই মানুষের প্রথম এবং প্রধান পরিচয় হওয়া উচিত- সাম্যের এই বাণী গুরুত্ব পেয়েছে। ‘উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন’ প্রবন্ধেও লেখক এটাই প্রত্যাশা করেছেন। লেখক আলোচ্য প্রবন্ধে মানবজাতি এবং তাদের ঐক্যবদ্ধ শক্তির জয়গান করেছেন। ভদ্র সমাজ যদি তাদের তথাকথিত ছোটলোক বলে অবহেলা না করে মানুষ হিসেবে মূল্য ও মর্যাদা দেয় এবং তাদের জেগে ওঠার সুযোগ দেয় তাহলে তারা জগতে অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারবে। উদ্দীপকে আলোচ্য প্রবন্ধের এই ধারণাগুলোই ব্যক্ত হয়েছে।

ঘ. জগতের সব মানুষের এক ও অভিন্ন পরিচয়- আমরা সবাই মানুষ। এই চেতনা উদ্দীপক এবং ‘উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন’ প্রবন্ধের মূল ভাব আর তা একসূত্রে গাঁথা।

পৃথিবীর নানা দেশে রয়েছে নানা জাতি। বিচিত্র তাদের জীবনধারা ও সংস্কৃতি। কিন্তু পৃথিবীর যে কোনো দেশের মানুষ একই চন্দ্র-সূর্যের আলোয় আলোকিত, একই লাল রক্ত তাদের শরীরে প্রবাহিত হয়। ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড়, উঁচু-নিচু, ধর্ম, বর্ণ প্রভৃতি দ্বারা সমানুষের পার্থক্য করা উচিত নয়।

উদ্দীপকে মানুষে মানুষে সাম্য ও মৈত্রীতে বন্ধনের দিকটি প্রকাশ পেয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের ধর্ম-বর্ণ জাতিভেদ ছাপিয়ে বড় পরিচয় সে মানুষ। তাই বিশ্বের এক মানুষ অন্য মানুষের আত্মীয় ও বন্ধু। ‘উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন’ প্রবন্ধেও কাজী নজরুল ইসলাম সাম্যবাদী মানসিকতার দিকটি ব্যাখ্যা করেছেন। ভদ্রলোকেরা যাদের ছোটলোক মনে করে তাদের অবহেলা ও উপেক্ষার শিকার হতে দেখে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। কারণ তারাও মানুষ। সমাজে তাদেরও অধিকার রয়েছে। প্রাবন্ধিক তাদের মর্মবেদনা বোঝার মত মানসিকতা অর্জনের জন্যও তথাকথিত ভদ্র লোকদের পরামর্শ দিয়েছেন।

‘উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন’ প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক মহাত্মা গান্ধীর প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, মহাত্মা গান্ধী যেমন করে নিম্ন শ্রেণি, গোষ্ঠী, জাতি ও ধর্মের মানুষদের ভাই বলে বুকে টেনে নিয়েছেন, তেমনি করে এ ছোটলোকদের ভালোবাসলে তাদের পক্ষে কঠিন কাজও করা সম্ভব। এই উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন হলে সাম্যবাদের বাণী ছড়িয়ে যাবে পুরো বিশ্বে। তখন পৃথিবীর মানুষ একই মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে। উদ্দীপকের পঙ্ক্তিতেও এভাবেই ফুটে উঠেছে। তাই, উদ্দীপকের মূল ভাব এবং ‘উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন’ প্রবন্ধের মূলভাব একইসূত্রে গাঁথা।



অ্যাসাইনমেন্ট : নিজে করুন

সৃজনশীল প্রশ্ন :

মাওলানা ভাসানী বাংলাদেশে সমাজ বিপ্লবের অগ্রসেনানী। এদেশে প্রচলিত সামন্তবাদ ও দুর্বৃত্ত পুঁজির বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন করেছিলেন। তিনি সঙ্গে নিয়েছিলেন দেশের কৃষক-শ্রমিক-জনতাকে। মাওলানা ভাসানী একাকার হয়ে গিয়েছিলেন মেহনতি জনতার কাতারে।

ক. বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের উপাধি কোনটি?

খ. ‘দেখিবে ইহারাই দেশে যুগান্তর আনিবে, অসাধ্য সাধন করিবে।’ -কারা এবং কিভাবে?

গ. উদ্দীপকের মাওলানা ভাসানী চরিত্রটি ‘উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন’ প্রবন্ধের কোন চরিত্রকে প্রতিফলিত করে? -আলোচনা করুন।

ঘ. “মাওলানা ভাসানী এবং মহাত্মা গান্ধীর চেতনা একইসূত্রে গাঁথা।” -উদ্দীপক ও ‘উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন’ প্রবন্ধের আলোকে মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।



উত্তরমালা: বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ঘ ২. গ ৩. গ ৪. ঘ ৫. ক ৬. খ ৭. খ ৮. খ